পরিচয় পর্ব

8ই নভেম্বর, 2014, নিখিল বিশ্ব আহমদীয়ার প্রধান, পঞ্চম খলীফা, পবিত্র নেতা, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.), একাদশ জাতীয় শান্তি সম্মেলনে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। উক্ত বক্তব্যে মাননীয় খলীফা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ISIS এবং অন্যান্য চরমপন্থী সংগঠনগুলির কঠোর নিন্দা করে এদের কার্যক্রমকে সম্পূর্ণরূপে ইসলামবিরোধী বলে ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন যে এই ধরণের সংগঠনগুলি সারা বিশ্বে ভয়ংকর এক সন্ত্রাসের জাল বিস্তার করেছে। পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে তিনি প্রমাণ করেন যে ইসলাম একটি শান্তিপ্রিয় ধর্ম, যে ধর্ম সমাজের সর্বস্তরে সহনশীলতা, পারস্পরিক সম্মান ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে শান্তি স্থাপনের কথা তুলে ধরে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ISIS এর মত চরমপন্থী সংগঠনগুলি কিভাবে তাদের অর্থ- সম্পদ ও সমর্থন সংগ্রহ করে ?

উক্ত অনুষ্ঠানটি লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে এক হাজারেরও বেশি শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন, যাদের মধ্যে ছিলেন সাড়ে পাঁচশ অ-আহমদী সম্মানীয় অতিথি, উপস্থিত ছিলেন ব্রিটেনের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীমহোদয়গণ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতগণ, পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্যগণ এবং আরও অনেক সম্মানীয় পদাধিকারী এবং অতিথিবর্গ।

এবারের শান্তি সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল- খিলাফত, শান্তি ও ন্যায়বিচার। উক্ত অনুষ্ঠানে আমাদের পবিত্র খলীফা, যুক্তরাজ্যের ম্যারিজ মিলস এর সি ই ও, ম্যাগনাস ম্যাগফারলেন ব্যারো সাহেবকে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে খাদ্য ও শিক্ষা প্রদানে অসামান্য স্বীকৃতি স্বরূপ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের

The Ahmadiyya Muslim Prize for the Advancement of Peace (দি আহমদীয়া মুসলিম প্রাইজ ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অফ পিস) পুরস্কারে ভূষিত করেন।

অনুষ্ঠানের মূল বক্তব্য শুরু করার পূর্বে সম্মানীয় অতিথিবর্গেরাও তাঁদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন, ইংল্যান্ডের আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জাতীয় প্রেসিডেন্ট জনাব রফিক হায়াত সাহেব, লর্ড তারিক আহমদ সাহেব, উইমব্লডন, জাতি বিষয়ক মন্ত্রক, সিওভাইন ম্যাক ডোন্যাক, এম. পি. অ্যানড চেয়ার অফ দি "অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ ফর দি আহমদীয়া মুসলিম কমিউনিটি", আর টি.হন. ই. ডি. ডাভে, এম.পি, সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর এনার্জি অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ, আর.টি.হন.জাস্টিন গ্রিনিং, এম.পি, সেক্রেটারী ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মোস্ট রেভারঅ্যান্ড কেভিন ম্যাকডোনালড, আর্চ বিশপ এমিরেটাস অফ সাউথওয়ার্ক, তিনি ভ্যাটিকান সিটির পক্ষ থেকে একটি বার্তা পাঠ করে শোনান।

একাদশ জাতীয় শান্তি সম্মেলন, লন্ডন উপলক্ষে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান হযরত মির্যা মসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ পঞ্চম (আই.) কর্তৃক প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ

মূল বক্তব্য

“হযরত মির্যা মসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ পঞ্চম (আই.) তাশাহুদ, তাঊয ও বিসমিল্লাহ্ পাঠ করেন এবং মূল বক্তব্য শুরু করেন, হে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু। আপনাদের সকলের উপর আল্লাহ্‌র শান্তি এবং আশিস বর্ষিত হোক।

সর্বপ্রথমে আমি আপনাদের সকলকে এই শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনারা অনেকেই অবগত যে, এই সম্মেলনটি বাৎসরিক অনুষ্ঠান হিসেবে বিগত একযুগ ধরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ক্যালেন্ডারে স্থায়ী-সূচি রুপে স্থান করে নিয়েছে। সাধারণতঃ আমরা এই অনুষ্ঠানটি মার্চ মাসে করে থাকি, কিন্তু এবছর বিভিন্ন কারণ হেতু দেরি হওয়ায় নভেম্বরে এসে পৌঁছেছে। আজ রাত্রে একটি জাতীয় স্মরণসভাও অনুষ্ঠিত হবে, যে কারণে নিমন্ত্রিত অতিথিদের অনেকেই আজ

হাজির হতে পারেননি।

এতদস্বত্বেও, আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ, যারা আজ এখানে উপস্থিত আছেন। আপনাদের উপস্থিতি নিশ্চিতরূপে এটাই প্রমাণ করে যে, আপনারা একটি বিশেষ মুসলিম সংগঠনের শান্তির বার্তা শোনার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন। কারণ বর্তমান বিশ্বে বিশ্বশান্তি নিয়ে প্রচুর কথা বলা হচ্ছে আর এই নিয়ে অনেক বিতর্কও উঠে আসছে। নিশ্চিতরূপে, বিশ্বের বৃহৎ অংশের জন্য বর্তমান ঘটনাপ্রবাহ ভয় ও উৎকণ্ঠার কারণ। যদিও এটি বড়ই বেদনার বিষয়, আমি নির্দ্বিধায় স্বীকার করছি যে বর্তমান বিশ্বের সিংহভাগ অরাজকতার জন্য নিশ্চিতরূপে তথাকথিত মুসলিমদের কার্যকলাপই দায়ী। যে কোন শান্তিকামী মুসলমান, যে তার ধর্মবিশ্বাসের মর্ম বোঝে, তার কাছে এটি একটি ভীষণ দুঃখ এবং হতাশার বিষয়। বিগত কয়েকবছর ধরে, একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী ভয়ংকরভাবে তার সন্ত্রাসের জাল বিস্তার করেছে এবং সারা বিশ্বের কাছে মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে উঠেছে। আমি ISIS বা IS নামক চরমপন্থী দলটির কথা বলছি।

এই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর কাজকর্মের প্রভাব শুধুমাত্র মুসলিম দেশেই সীমাবদ্ধ নয় বরং ইউরোপের দেশগুলি এবং ইউরোপ ছাড়িয়ে আরও দূরের দেশগুলিও এর নিষ্ঠুরতার শিকার। আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে দেখি যে, ইউরোপ এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশের মুসলিম যুবকরা উদ্বেগজনকহারে এই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে ISIS-ই খাঁটি ইসলামের সত্যিকারের প্রতিনিধি এবং এরা তাদের আদর্শকেও সমর্থন করে। এবং এই যুবকেরা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ তাদের সাহায্য

করার জন্য এমনকি তারা যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত!

ধারণা করা হয় যে, ইংল্যান্ড থেকে 500 জন মুসলিম যাদের অধিকাংশই যুবক, সিরিয়া এবং ইরাকে পৌঁছে গেছে ISIS এর সমর্থনে যুদ্ধ করতে। এটি এমন একটা যুদ্ধ যেটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটি ইসলামের স্বপক্ষে করছে বলে, মিথ্যা দাবি করে। যদি আমরা এদের সংখ্যার দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব যে, এই তথাকথিত জিহাদের সমর্থনে U.K থেকে সিরিয়া এবং ইরাকের উদ্দেশ্যে যাওয়া মুসলিমদের সংখ্যার অনুপাত, জার্মানি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি।

এটি U.K এর জন্য ভীষণই আশংকাজনক এবং গভীর উদ্বেগের বিষয়। কারণ ISIS এবং তাদের তথাকথিত খলীফা তথা নেতার কর্মসূচি এবং উদ্দেশ্য অতীব ভয়ংকর এবং বর্বরোচিত। তাদের খলীফা চায় যে, তারা 'প্রতি

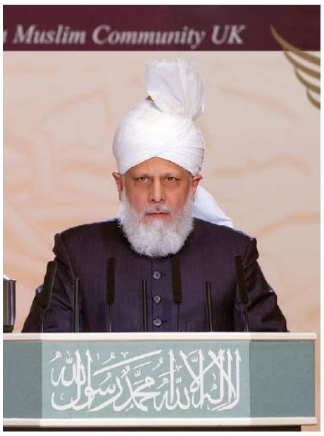

-শোধ' নেবে সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে এবং সমস্ত দেশ ও জাতি সমূহের উপর বিজয় লাভ করবে। সেই খলীফার আকাঙ্খা এই যে, মুসলিমরা সারা পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব লাভ করবে এবং অমুসলিমরা তাদের দাসত্ব বরণ করবে অথবা 'সম্পত্তিতে' পরিণত হবে। তার মতানুসারে, কোন ব্যক্তি মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোন অপ্রীতিকর কাজ করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং সারা পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের, প্রতিটি ব্যক্তির উপর শরীয়তের আইন বলবৎ করা হবে। সে অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের নারীদের অধিকারও খর্ব করে, তাদের পত্নী বা উপপত্নী রূপে পাওয়ার বাসনা পোষণ করে। ISIS তার সাথে দ্বিমত পোষণকারী প্রতিটি জাতি ও ধর্ম- সম্প্রদায়কে ধ্বংস করতে এবং মুসলিম শাসকদের উৎখাত করে তাদের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে মরিয়া। অতএব এদের বক্তব্য যদি সত্যি হয়, তাহলে এদের কৌশল এবং দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী। এবং তাদের মূল উদ্দেশ্য, পৃথিবীর শান্তি ভঙ্গ করা। যদি কেউ মনে করে যে, ISIS বা কোন চরমপন্থী দল কোনোদিনও পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তারে সফল হবে তবে তার ভাবনা

নিছকই কল্পনাপ্রসূত। কারণ এটি পরিষ্কার যে, এই দলগুলির পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নির্বোধ এবং বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি তাদের পথ রুদ্ধ না করা যায় তবে তারা নিজেরা ধ্বংস করার আগে এক বিরাট ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংস সাধনকারী হয়ে দাঁড়াবে। আমরা এই ধরনের বহু সন্ত্রাসী ও ধ্বংসাত্মক ঘটনার সাক্ষী। যেখানে একা একজন মানুষ কোনো ধরণের সাহায্য ও সমর্থন ছাড়াই চরম ধ্বংস সাধনে সক্ষম হয়। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলগুলিতে প্রায়শই কয়েকমাসের ব্যবধানে নিয়মিত গুলি চালনার মত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটছে এবং যেখানে বহুসংখ্যক নিরীহ শিশুদের প্রাণহানির কারণ কোন একজনমাত্র ব্যক্তির ঘৃণিত পাগলামি। তাহলে একবার ভেবে দেখা দরকার যে, এমন একটি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী যারা এইধরণের একদল হতাশ এবং অস্থির ব্যক্তিদের সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একত্রিত করেছে এবং যারা এমন ধ্বংস সাধনের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতেও বদ্ধপরিকর, তারা কি পরিমাণ ধ্বংস এবং ক্ষতিসাধন করতে পারে।

এটি বিশেষতঃ এমন একটি বাস্তব বিষয় যে এরা শুধুমাত্র নিজেদের ইচ্ছেশক্তির বলে বলীয়ান কোন গোষ্ঠী নয় এরা ভয়ঙ্কর অস্ত্র এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও পারদর্শী বন্দুকবাজ। প্রকৃতপক্ষে এটি আর প্রশ্নাতীত বিষয় নয় যে, তারা অবশেষে পারমানবিক অস্ত্রও হাতে পেয়ে যাবে। আমি যেমনটি বলেছি যে, এই ধরণের মানসিক বিকারগ্রস্ত,তারা কোন চিরস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য পাবে না, কিন্তু সাময়িকভাবে তারা নিশ্চিতরূপে কিছু অঞ্চল দখল করবে এবং বহুল ক্ষতিসাধন করবে। ISIS বা এই ধরনের একই আদর্শের এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর কার্যক্রম বিবেচনা করে হতবুদ্ধি হয়ে যেতে হয় যে এরা এই পৃথিবীর জন্য কি ভয়ংকর এক হুমকিস্বরূপ।

বাস্তব অবস্থা এই যে, এ সমস্ত কিছুই ইসলামের নাম নিয়ে করা হয় যা সত্যই একজন শান্তিকামী মুসলমানের জন্য গভীর কষ্ট ও বেদনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় কারণ এধরণের নৃশংস এবং অমানবিক আদর্শের সাথে ধর্মের কোন সংযোগ নেই। বরং সর্বক্ষেত্রে এবং সমস্ত স্তরে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হল সমগ্র মানবজাতির জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার বিধান সুনিশ্চিত করা। যদি আমরা পবিত্র কোরআন শরীফ এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র জীবনাদর্শের দিকে তাকাই, আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট হবে যে, পূর্বেকার যুগের মুসলমানরা

কোনও প্রকার যুদ্ধ বা হিংসার সূচনা করেনি। যখনই মুসলমানরা কোনও প্রকার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তা তারা নিজেদের কর্তৃত্ব জাহির করার বা

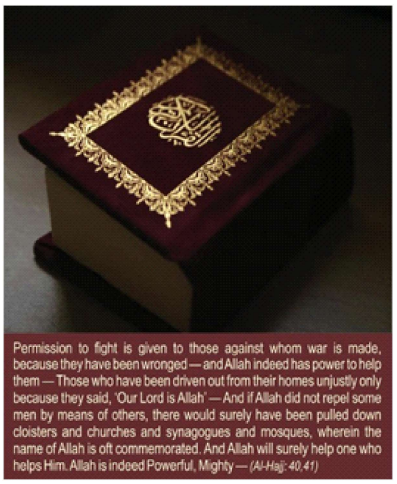

অন্যায্য উপায় অবলম্বনের জন্য করেনি। বরং তাদের যুদ্ধ ছিল প্রকৃত অর্থে, অত্যাচারীদের বর্বরতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার এবং নিজেদের আত্মরক্ষার যুদ্ধ। তারা কখনই অন্যান্য জাতিগুলিকে অধীনস্থ করতে বা তাদের আবাসভূমি দখল করে তাদের বন্দী বানাতে চায়নি। পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন এই সাক্ষ্য বহন করে যে,নবুয়তপ্রাপ্তির প্রাথমিক যুগে তাঁর একমাত্র চাহিদা ছিল ভালবাসা এবং স্নেহের মাধ্যমে তাঁর আদি বাসভূমি মক্কায় ইসলামের শিক্ষার প্রসার ঘটানো। যাহোক, মক্কার অধিবাসীরা শুধুই যে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে তা নয় বরং সর্বাত্মক নৃশংস এবং নির্দয় আচরণ করেছে তাঁর সঙ্গে। তিনি এবং তাঁর অনুগামীদের নির্দয়ভাবে নিগৃহীত হওয়ার ঘটনা মাত্রা অতিক্রম করলে ঐশী নির্দেশে, পবিত্র নবী (সা.) মক্কা ছেড়ে মদিনা শহরে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হন। এতদসত্ত্বে, দেশত্যাগী হবার পরেও মক্কাবাসীরা মুসলমানদের ছাড় দেয়নি বরং অস্ত্রশস্ত্রে সু-সজ্জিত এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। সেই প্রথমবার, আল্লাহ্‌র আদেশে, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মুসলমানদের যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করা হয়। যে কারণে এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল তা স্পষ্টভাবে কুরআনের 22তম সূরা (আল্ হাজ্জ)-এর আয়াত 40-41 এ উল্লেখ আছে, যেখানে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, যদি মুসলমানদের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি না দেওয়া হত তাহলে সারা পৃথিবীর শান্তিই ঝুঁকির মুখে পড়ে যেত। এর কারণ ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বীরা শুধু যে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল তা নয় বস্তুতঃ তারা পৃথিবীতে যে কোনো ধর্মের নাম ও অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। সুতরাং কুরআনের বর্ণনা অনুসারে, যদি এই অনুমতি দেওয়া না হত তবে চার্চ,সিনেগগ, মন্দির বা অন্য কোনও উপাসনাগৃহ নিরাপদ

থাকত না। অতএব, মুসলমানদের দেওয়া যুদ্ধের অনুমতি শুধুমাত্র ইসলামকে রক্ষার জন্যই ছিল না বরং সামগ্রিকভাবে ধর্মকে রক্ষা করার জন্যই ছিল এই লড়াই, যা উপরে উল্লেখিত বাণীর ভিত্তিতে হয়েছিল।

এই বাণীর আলোকে যদি বোঝার চেষ্টা করেন আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে আজকের তথাকথিত মুসলমানরা চুড়ান্ত বিভ্রান্ত; যারা দাবী করে যে অমুসলিমদের হত্যা করার, তাদের ভূমি দখল করে দাস বানানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম হল এমন এক ধর্ম যা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার সুনিশ্চিত করে। এবং ইসলাম হ'ল সেই ধর্ম যা যেকোন মানুষের শান্তি এবং সমন্বয়ের সাথে বাঁচাকে সুনিশ্চিত করে তা সে সমাজের যেকোনও স্তরের বা যেকোনও ধর্মবিশ্বাসেরই হোক না কেন। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, কিভাবে পবিত্র নবী (সা.) তাঁর অনুগামীদের সাথে মদীনায় স্থানান্তরিত হয়েছিলেন এবং যেভাবে মুসলমানরা স্থানীয় সমাজের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে মিশে গিয়েছিলেন, সেটি যেকোন সমাজে অভিবাসন এবং একাত্ম হওয়ার একটি আদর্শ নমুনাস্বরূপ। মুসলমানরা মদীনায় পৌঁছনোর পূর্বে সেখানে দুটি প্রধান সম্প্রদায় ছিল- ইহুদী এবং আরব। মুসলমানদের আবির্ভাবের ফলে সেখানে তিনটি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটল- মুসলমান,ইহুদী এবং অমুসলিম আরব জাতি। পবিত্র নবী (সা.) অবিলম্বে বর্ণনা করলেন এটা জরুরী যে সবাই যেন একত্রে শান্তি এবং সম্প্রীতির সাথে সহাবস্থান করে এবং সেজন্য তিনি তাদের মধ্যে একটি শান্তি-অঙ্গীকারপত্রের প্রস্তাব করলেন। এই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং গোষ্ঠীকে তাদের প্রাপ্য অধিকার দেওয়া হল। প্রত্যেক গোষ্ঠীর জীবন এবং সুরক্ষার অঙ্গীকার করা হল এবং যেকোনো পূর্ব-প্রচলিত আন্তঃউপজাতীয় রীতি-নীতিকেও সম্মান প্রদর্শন করা হ'ল। এ বিষয়ে সবাই একমত হ'ল যে, মক্কা থেকে আগত যেকোনো দূরভিসন্ধিকারীকে তারা মদীনায় নিরাপদ আশ্রয় দেবে না এবং তাদের দলভুক্ত করবে না। এর পরেও কোন সাধারণ (যারা তিনটি জাতির কাছেই শত্রু বলে বিবেচিত) শত্রু দ্বারা যদি কোনও আক্রমণ সংঘটিত হয় তবে তিনটি গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে তাদের প্রতিহত করবে এবং মদীনাকে সুরক্ষিত করবে। যদিও এটি পূর্বপ্রতিষ্ঠিত যে মদীনার বাইরে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করা হয় সেক্ষেত্রে অ-মুসলিমদেরকে, মুসলিমদের

পাশাপাশি যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হবে না। এছাড়াও ইহুদীদের সাথে সংঘটিত অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির চুক্তিগুলিকেও মুসলিমরা যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবে। ইহুদী এবং মুসলিম উভয়পক্ষই নিজস্ব ধর্ম-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে জীবনযাপন করবে।

যখন উক্ত তিন গোষ্ঠী এই সন্ধির শর্তগুলিতে সহমত হল, তখন তারা সম্মিলিতভাবে পবিত্র নবী (সা.) কে রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে মনোনীত করল। সর্বোপরি, যেমনটা আমি পূর্বেও বলেছি, ইহুদীরা শরীয়তের বিধান মানতে বাধ্য নয় কিন্তু তারা তাদের (ইহুদীদের) ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি অবশ্যই দায়বদ্ধ থাকবে। এটাই ছিল ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা (সা.)-এর সহনশীলতা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য প্রদর্শনের এক যথার্থ নিদর্শন। তথাপি সাম্প্রতিককালে ISIS ধর্মমত, সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সবার উপর শরীয়তের আইন জোরপূর্বক চাপিয়ে দিতে চায়।

তৎকালীন সেই অঙ্গীকারপত্রে পবিত্র নবী (সা.) নারীর অধিকারও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এটি নিশ্চিত করা হয়েছিল যে, কোন নারীকে তার বাসগৃহ থেকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক উৎখাত করা যাবে না। সেক্ষেত্রে, ISIS- এর দাবী কতটা যুক্তিযুক্ত ; তাদের বক্তব্য, অমুসলিম নারীরা তাদের দখলকৃত সম্পত্তি? এই অঙ্গীকারপত্রের বয়ান অনুযায়ী, কোন ব্যক্তিকে কখনও ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে না বরং ইহা স্পষ্টভাবে বিবৃত করা হল যে, মুসলিমরা মদীনাবাসী ইহুদী এবং অমুসলিমদের প্রতি নিজ ভাইয়ের মত ভালবাসা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করবে। সুতরাং, এটাই ছিল চুক্তির সংক্ষিপ্তসার যা মদীনার সমাজ এবং পরবর্তীকালে আগত মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য-বন্ধন স্থাপন করেছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে যে, মুসলিমরা এই চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল এবং যখনই এই অঙ্গিকারপত্র লঙ্ঘিত হয়েছে, তা অন্যান্য জনগোষ্ঠীগুলির মাধ্যমেই হয়েছিল। মদীনার স্বীকৃত শাসক হিসেবে পবিত্র নবী (সা.) কে প্রায়শই চুক্তিলঙ্ঘনকারী বা অন্যায়কারী ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর সম্মুখীন হতে হত। কিন্তু সেই তিরস্কারগুলিও কোনপ্রকার অবিচার ব্যতিরেকে, চুক্তিপত্রের শর্ত-অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গত ভাবে করা হত। সেজন্য এটাই হ'ল সত্যিকার অর্থে ইসলামী সরকারের পরাকাষ্ঠা যার সূচনা পবিত্র নবী (সা.)-এর হাতে হয়েছিল এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চার জন

সঠিকপথে অধিষ্ঠিত খলীফা তা অব্যাহত রেখেছিলেন এবং যা তাঁদের পরবর্তী 100 বছরকাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

সুতরাং আজকের দিনে যদি ISIS বা কোন মুসলিম সরকার ন্যায়বিচার ও সাম্যের এই নীতির পরিপন্থী কোনও কাজ করে, তাহলে তারা শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে এমনটি করে থাকে।যদিও তারা ইসলামের পক্ষে কাজ করছে বলে দাবী করে, প্রকৃতপক্ষে তাদের কর্মকান্ডের সাথে ইসলাম বা পবিত্র নবী (সা.)-এর শিক্ষার কোন সংযোগ নেই।

যদি আমরা ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাই দেখব, মহানবী (সা.) -এর আবির্ভাবের পূর্ণকালীন সময়ে এটি এমন এক সমাজ ছিল যেখানে প্রত্যেক উপজাতি তাদের অধিকার জাহির করার জন্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকত। এতদ্‌সত্ত্বেও এই সেই সমাজ যেখানে পবিত্র নবী (সা.) এক নবজাগরণের সূচনা করেছিলেন যেখানে ন্যায়বিচারের এক যথাযথ ব্যবস্থাপনা ছিল। যার মাধ্যমে প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকার তাদের নিজেদের ঐতিহ্য ও ধর্মমতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কেউ যদি ইসলামের ইতিহাসকে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে তবে সে দেখতে পাবে যে ইসলামের প্রাথমিক যুগে পবিত্র নবী (সা.) এবং তাঁর চার ন্যায়নিষ্ঠ খলীফাগণের যুগে মুসলিমদের আচরণ ছিল অনুকরণযোগ্য।

তারা কখনও কোনও যুদ্ধে আক্রমণকারী হিসেবে অংশ নেয়নি বা কখনও তাদের কোন ভূখন্ড দখলের অভিপ্রায় ছিল না। যেখানেই তারা ইসলামের শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছে তারা এই প্রচারের কাজ সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ভাবেই করেছে। উদাহরণস্বরূপ, দেখুন ইসলাম চীন ও দক্ষিণ ভারতে প্রসারিত হয়েছে এবং ইতিহাসের কোথাও একথা বর্ণিত নেই যে মুসলিম সৈন্যরা এই জাতিগুলিকে আক্রমণ করেছিল। বরং এই সমস্ত দেশসহ অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যেও ইসলাম প্রসারিত হয়েছে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কারণে কিছু মুসলিম শাসকেরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, যদিও সেগুলির জন্য শুধুমাত্র তাদেরকেই দোষারোপ করা যায় না, তবুও সেই সব যুদ্ধে অবরুদ্ধ অধিবাসীদেরও কখনওই ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা হয়নি।

নিশ্চিতরূপে পবিত্র কুরআন এ ধরণের কাজকে প্রত্যাখ্যান করে এবং ইসলাম প্রসারণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বনের শিক্ষা দেয়।

যেমনটা আমি পূর্বেও বলেছি, যখন আল্লাহ্‌তা'লা যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেছিলেন তখন সেটা ছিল একমাত্র সবধরণের ধর্মকে রক্ষা করার জন্য, কখনই কেবল ইসলামকে রক্ষা করার জন্য নয়। কুরআনের বিভিন্ন সূরা (অধ্যায়)-য় মহান আল্লাহ্‌তা'লা যুদ্ধের বিভিন্ন রীতির উল্লেখ করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় সূরা (সূরা বাকারা)-র আয়াত 191 এ আত্মরক্ষামূলক লড়াই এর মূলনীতি স্থাপন করতে গিয়ে মহান আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, তাদেরকে প্রতিহত কর যারা তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না বা নির্দয় হয়ো না। কেননা, অন্যায়কারীদের আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন না।

পুনরায়, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌ কুরআনের 16 তম সূরা (সূরা আন্‌ নাহ্‌ল)–র আয়াত 127 এ মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বলেন, যুদ্ধের সময় তারা যেন সীমা অতিক্রম না করে বা মাত্রাতিরিক্ত কিছু না করে। আল্লাহ্‌ বলেন- শাস্তির ব্যাপ্তি কৃত অন্যায়ের সমানুপাতিক হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় সূরা (সূরা বাকারা)-র আয়াত 194 এ ,যেখানে মহান আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, যুদ্ধ চলাকালীন, লড়াই ততক্ষণ অবধি চালিয়ে যাওয়া উচিত যতক্ষণ না নির্যাতন শেষ হয়ে ধর্ম পুনঃস্থাপিত হয়। এখানে বলা হয়েছে, যদি অত্যাচারীরা ক্ষান্ত দেয় এবং বিশৃঙ্খলা বন্ধ করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ শত্রুতা প্রদর্শন করা যাবে না।

অষ্টম সূরা (আন্‌ আনফাল)-র আয়াত 62 তে মহান আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, যদি অত্যাচারীরা শান্তি স্থাপনে আগ্রহী হয় এবং সমন্বয়সাধনের উদ্দেশ্যে তাদের হাত প্রসারিত করে, মুসলিমদের কর্তব্য, বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের প্রস্তাবে সম্মত হওয়া।

নবম সূরা (সূরা আত্‌ তাওবা)-র আয়াত 4 এ মহান আল্লাহ্‌তা'লা আরও বর্ণনা করেন যে, চুক্তি মোতাবেক প্রত্যেক মুসলমান তাদের পক্ষ থেকে পৌত্তলিকদের সাথে সম্পাদিত সকল শর্তাবলী পরিপূর্ণরূপে পালন করবে

যদি না দ্বিতীয় পক্ষ (পৌত্তলিকগণ) তাদের তরফ থেকে কোনো প্রকারের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ প্রকাশ করে অথবা উভয়ের মধ্যে সম্পাদিত কোনো চুক্তির ব্যতিক্রম করে। আল্লাহ্ বলেন, এটাই ন্যায়পরায়ণতার ক্ষেত্রে জরুরী বিষয় এবং আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণকারীদের পছন্দ করেন।

পঞ্চম সূরা (সূরা আল্ মায়েদা)-র আয়াত 9-এ আল্লাহ্তা'লা যুদ্ধের সময়ও মুসলিমদের ন্যায়-পরায়ণ আচরণের নির্দেশ দেন। কোন জাতি বা গোত্রের উপর শত্রুতাবশতঃ মুসলিমরা যেন অন্যায্য কর্ম না করে কারণ সেটা ন্যায়-সম্মত নয়।

অষ্টম সূরা (সূরা আল্ আনফাল)-এর আয়াত 68-এ মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেন, একজন নবীর পক্ষে এটা কখনই শোভনীয় নয় যে, তিনি বন্দীদের যুদ্ধবসানের পরেও আটক করে রাখেন। যদি এমনটা ঘটে সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে তিনি খোদার ভালবাসা নয়- সম্পদ ও ক্ষমতার প্রতি লোভকে প্রাধান্য দেন।

সুতরাং, এটি খুব সুস্পষ্ট ভাবেই প্রমাণিত যে, যুদ্ধ বহির্ভূত কোনো ব্যক্তিকে বন্দী করে রাখা নিষেধ এবং এরপরেও আজকাল আমরা লক্ষ্য করছি এসমস্ত তথাকথিত ইসলামপন্থীরা জোরপূর্বক অগণিত নিরীহ মানুষকে কারাবন্দী করেছে আর অন্যদিকে অসহায় নারীদের করেছে উপপত্নী।

পবিত্র কুরআনের 47 তম সূরা (সূরা মুহাম্মদ)-এর আয়াত 5-এ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তা'লা ঘোষণা করেন যে যুদ্ধ চলাকালীন আটককৃত বন্দীদেরকে যুদ্ধ সমাপনকালে মুক্তি প্রদান করতে হবে। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,তাদেরকে প্রদেয় অর্থের বিনিময়ে মুক্তি প্রদান করা উচিত। অথবা আরো প্রকৃষ্ট হয় যদি তাদের ক্ষমা এবং দয়া প্রদর্শন করে মুক্তি দেওয়া হয়।

সুতরাং যখন যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে তখন যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি প্রদান করতে হবে এবং এটা নারী এবং পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই কার্যকর হবে। প্রাথমিক যুগে নারীরাও যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন যুদ্ধরত পুরুষ যোদ্ধাদের সমর্থন ও উৎসাহ দিতে এবং এভাবে তারাও যুদ্ধবন্দীতে পরিণত হতেন। পবিত্র কুরআনে ইহা সুনিশ্চিত করা হয়েছে, যে কোনো নারীর প্রতিই কোনো ধরনের নিষ্ঠুরতা

অথবা হিংসাত্মক আচরণ করা যাবে না।

একজন বন্দীকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রদত্ত অর্থ সম্পর্কে 24তম সূরা (আন্ নূর)-এর আয়াত 34-এ কুরআন বলে: যদি কোন ব্যক্তি একজন বন্দীকে মুক্ত করার অর্থভার বহন করতে অসমর্থ হয় সেক্ষেত্রে কিস্তিতে অর্থ গ্রহণ করে বন্দীকে মুক্ত করা উচিত।

যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে এই আয়াতগুলিকে প্রাথমিক যুগের যুদ্ধকালীন সময়ের আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করতে হবে। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকে নিজস্ব খরচে ও ব্যক্তিগত অস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধ করতেন। সুতরাং তারা তাদের বন্দীদের মুক্ত করার পরিবর্তে প্রদেয় অর্থ গ্রহণে অনুমতিপ্রাপ্ত ছিলেন।

যেহেতু আজকাল যুদ্ধ অভিযানের যাবতীয় সমস্ত খরচ সরকারই বহন করে থাকে সুতরাং সৈন্যদের কোনো ব্যক্তিগত খরচ নেই। অতএব যুদ্ধবন্দীদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে তা নিরূপণ করবে সরকার অথবা কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা, কোনো সৈন্য বিশেষ নয়। দীর্ঘমেয়াদী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুই জাতীর মধ্যেকার বন্দী বিনিময় প্রথা বা অন্যান্য আনুসাঙ্গিক বিষয়াদী অবশ্যই সরকারি পর্যায়ে সম্পাদিত হওয়া উচিত। ইদানিংকালের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত ভাবে কাউকে কারাবন্দী করার রীতি বিবর্জিত এবং সম্পূর্ণরূপে ইসলামের পরিপন্থী।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তা'লা আরও বলেছেন যে, অন্যের সম্পদের প্রতি হিংসাত্মক দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত নয় এবং বিশ্ব শান্তি বিস্তারে এটি একটি স্বর্ণাদর্শ। যদি কেবলমাত্র এই ইসলামিক অনুশাসনটি অনুসরণ করা হয় তাহলে কখনো কোনো মুসলিম সম্পর্কে অপরের সহায় সম্পত্তি জবরদখলের প্রশ্ন উঠবে না।

কুরআনের দশম সূরা (ইউনুস)-এর আয়াত 100-এ আল্লাহ্ বলেন যে, তিনি সর্বশক্তিমান, যদি তিনি চান তবে তিনি সমগ্র দুনিয়াকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে সক্ষম। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্তা'লা মানব জাতিকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেননি এবং পবিত্র রসূল (সা.) কে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, ইসলাম

প্রচারে বলপ্রয়োগ অনুমোদিত নয় এবং ধর্ম ব্যক্তি বিশেষের হৃদয় ও উপলব্ধির বিষয়। সুতরাং এটা স্পষ্ট, কোনো ব্যক্তিকে বলপূর্বক ইসলাম বা অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা একেবারেই অননুমোদিত।

অবশ্যই মুসলমানদের ইসলামের বাণী প্রচার করতে বলা হয়েছে, তবে এই পর্যন্তই। এতদ্বারা, 18নং সূরা (আল্ কাহ্ফ)-এর আয়াত 30 এ মহান আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র রসূল (সা.) কে নির্দেশ দিয়েছেন গোটা দুনিয়াকে জানিয়ে দিতে যে তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক সত্য এসেছে। যা সফলতা ও সমৃদ্ধির ধারাবাহক, এবং তারা সেটা স্বাধীন ভাবে গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে। এই ঘোষণাগুলি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সবার জন্য বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেকটি মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হওয়া বা না হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। এবং যখন পবিত্র নবী (সা.) কে কেবলমাত্র ইসলামের বার্তা প্রেরণ করা ছাড়া অন্য কিছুর অনুমতি দেওয়া হয়নি তখন বর্তমানের তথাকথিত মুসলিম নের্তৃবর্গ কিভাবে এই নীতিকে অতিক্রম করে? তারা কি নিজেদেরকে ইসলামের নবীর থেকে বেশী ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও অধিকারের দাবিদার মনে করে? সেজন্য, আমি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে ইসলামের শিক্ষাকে সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম। যার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, নিষ্ঠুরতার যে আচরণ বিভিন্ন মুসলিম গোষ্ঠী বা জাতিগুলি প্রদর্শন করে তা ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

আপনারা হয়তো অবাক হয়ে ভাববেন, এটা যদি ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থীই হয়ে থাকে, তবে কেনো তারা এইরূপ আচরণ করছে?

সহজ উত্তরটি হ'ল, যেমনটি আমি আগে বলেছি, তারা কেবল এই পার্থিব দুনিয়ার আকর্ষণ পরিপূর্ণ করার পথ অন্বেষণ করে মাত্র। তাদের অভিষ্ট লক্ষ্য একেবারেই আত্মিক অথবা ধর্মনিষ্ঠ নয়। ধর্মের দোহাই দিয়ে নির্মমতা এবং রক্তক্ষয়ের মাধ্যমে জাগতিক অভীষ্টবস্তুকে অর্জন করাই তাদের উদ্দেশ্য।

আমি পুনরায় বলি, কোন আহমদী মুসলিম বা যেকোনও শান্তিপ্রিয় মুসলিম এই ভেবে গভীর মর্মবেদনা অনুভব করে যে, তাদের প্রকৃত ধর্মকে কি অন্যায্য উপায়ে কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে। যাইহোক, এ প্রসঙ্গে আমি বিনীতভাবে সেইসমস্ত ব্যক্তি, রাজনীতিবিদ বা সংস্থাগুলিকে প্রশ্ন করতে চাই যারা

চরমপন্থীদের পাশবিকতার ভিত্তিতে ইসলামকে একটি হিংস্র ধর্ম বলে আখ্যায়িত করে।

আমি তাদের অনুরোধ করবো একটু বিবেচনা করে দেখতে যে এই দলগুলোর পক্ষে কিভাবে এই বিশাল পরিমাণ অর্থরাশি করায়ত্ত করা সম্ভব হয়েছে, যার দ্বারা তারা এতো দীর্ঘ কাল ব্যাপী তাদের এই সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ও যুদ্ধবিগ্রহ চালিয়ে যাচ্ছে? কেমনভাবে তারা এতো অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করে? তাদের কি অস্ত্রশস্ত্র শিল্পের কারখানা আছে? এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে তারা সাহায্য এবং সমর্থন পাচ্ছে কোনো বিশেষ শক্তিগুলির পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে। এটি হতে পারে তৈল সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের সরাসরি সমর্থন অথবা অন্য কোনো বৃহৎ পরাশক্তিগুলি, যারা প্রচ্ছন্ন ভাবে তাদের সহযোগিতা প্রদান করছে।

যখন ISIS প্রথম আত্মপ্রকাশ করলো তখন বলা হলো যে তারা জাতীয় সশস্ত্রবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র করায়ত্ত করে নিয়েছে এবং কিছু অস্ত্রাগারও জবরদখল করে নিয়েছে - হতে পারে এটি সত্য, কিন্তু এটা কখনোই এযাবৎকাল পর্যন্ত তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যদি কোন সশস্ত্রবাহিনীর সরবরাহের পথ রূদ্ধ করে দেওয়া হয় তবে তাদের পক্ষে চলা অসম্ভব অথচ ISIS- এর এই সরবরাহ যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এও বলা হয়ে থাকে যে এই মুহূর্তে বিমানবিধ্বংসী ক্ষেপনাস্ত্র এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রাদি তাদের হস্তগত হয়েছে। এই সমস্ত বর্ণিত বিষয়গুলি ISIS- এর সমর্থনে চালু থাকা একটি সরবরাহ রেখার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। এটাও একটি সাধারণ জ্ঞানের বিষয় যে তাদের হাতে কয়েকশো মিলিয়ন ডলার আছে অতএব এটা উপলব্ধি করা যায় যে তাদেরকে বাইরে থেকে সমর্থন করা হয়। বহু আধিকারিক, বিশ্লেষক এবং ভাষ্যকারগণ প্রকাশ্যে এই মতবাদ সমর্থনে স্বীকৃতি জানিয়েছেন।

যেমন ধরুন, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ প্রতিনিধি, ডেভিড কোহেন, যিনি কিনা সন্ত্রাসবাদ এবং অর্থনৈতিক উপদেষ্টার একজন সচিব, তিনি জনসম্মুখে একথা ব্যক্ত করেছেন যে ISIS হলো, “আমাদের মোকাবেলাকৃত সর্বাধিক আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী।” তিনি

বলেন তারা প্রতি মাসে দশ লক্ষ ডলার আয় করে কালোবাজারে তেল বিক্রির মাধ্যমে। আমাদের প্রশ্ন করতে হবে কোথা থেকে এবং কি রূপে তারা এই বিশাল তৈল ভান্ডারের ওপর এমন অবাধ অধিকার পেয়েছে? বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে, তেল বহন এবং বিক্রি করা হয় কয়েকটি বিশেষ তেল সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের অত্যন্ত কঠোর নজরদারী এবং অনুমোদনের মাধ্যমে। এরপরও কোনো না কোনো ভাবে ISIS সকল প্রকারের নিয়মনীতির পাশ কাটিয়ে যায় এবং বিপুল পরিমাণে তেল ক্রয়-বিক্রয় করে কোনো প্রকারের বাধাবিঘ্ন ছাড়াই। যদিও আমরা সবাই জানি যে এতো বিপুল পরিমাণে তেলের বহন অথবা লেনদেন খুব সহজেই লুকানো সম্ভবপর নয়।

এমনটাও বলা হয়ে থাকে যে ISIS মুক্তিপণ আদায়ের মাধ্যমে নিয়মিত রোজগার করে থাকে। এরপরেও বলবো এটা তাদের অন্যান্য আয়ের উৎসের তুলনায় অতি তুচ্ছ।

এই দলগুলোর অর্থসম্পদ এক বিশাল মাথাব্যথার কারণ। কেন না তারা এই অর্থায়নের সাহায্যেই অরক্ষিত দল অথবা ব্যক্তিবর্গের ক্ষতিসাধন করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, ইদানিংকালের এক রিপোর্টে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যদি কোনো পরিবার তার কোনো একজন সদস্যকে ISIS এ যোগদান করার জন্য প্রেরণ করে তবে তাদেরকে প্রাথমিকভাবে এককালীন কয়েক হাজার ডলার এবং পরবর্তীকালে নিয়মিত শত শত ডলার প্রদান করা হয়ে থাকে। তদনুসারে এই দল গুলোর অর্থায়ন বন্ধ করতে এখনই কিছু একটা করা জরুরী।

পশ্চিমাবিশ্ব এখন এটি উপলব্ধি ও স্বীকার করতে শুরু করেছে যে, এটা এমন এক যুদ্ধ যা সরাসরি তাদের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। যা হোক, এটি আসলে চরম অবমূল্যায়ণ। প্রকৃত সত্য হল, এটি সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। বস্তুতঃ আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে, প্রধান শক্তিগুলির এটি একটি নিত্য নৈমিত্তিক কাজ যে তারা মুসলিমদেশগুলির বিভিন্ন বিষয়ে প্রগাড় প্রভাব বিস্তার করে । এমনকি সেদেশে তারা নিয়মনীতিরও প্রচলন করতে সক্ষম। সুতরাং প্রশ্ন হল তাদের এই প্রভাব তারা সেখানে কেন জাহির করছে না যেখানে এটি প্রয়োজন।

সর্বপ্রকার চরমপন্থার মোকাবিলায় কেন কোনো যৌথ, একত্রিত এবং সুসংহত প্রয়াস নেই ? এমনকি যে প্রচেষ্টাগুলো এখন নেওয়া হচ্ছে সেগুলোও এই দলটির কর্ম-তৎপরতার তুলনায় তুচ্ছ। আমার মতে, আজ যা ঘটছে তার জন্য শুধুমাত্র মুসলিম বিশ্বই যে একমাত্র দায়ী তা নয়, বরং দীর্ঘকালব্যাপী ঘটে চলা এই দূরাবস্থার পেছনে বহিঃশক্তিরও যথেষ্ট অবদান আছে।

দীর্ঘকালব্যাপী সিরিয়া এবং ইরাকের মত দেশগুলিতে অভ্যন্তরীণ বিবাদে বহিঃশক্তিগুলি অস্ত্র, অর্থ এবং সমর্থন যুগিয়ে তাদের সাহায্য করে আসছে এবং এখন অবস্থা এ সমস্ত অর্থপ্রদানকারীদেরও নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তারা তাদের চরমপন্থী মতাদর্শে বলীয়ান হয়ে সর্বপ্রকার ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠেছে। যা আমি বলছি, তা পূর্বেই মিডিয়ার কাছে প্রকাশিত। ISIS এর মত জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি এই সমস্ত নীতির ফসল এবং এরা তাদের সন্ত্রাসের জাল সমগ্র বিশ্বের সর্বত্র বিস্তার করে ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে।

পুনরায় আমি বলি, আমি গভীরভাবে দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন, যে এই অশুভক্রিয়াগুলির সাথে ইসলামের নাম জড়িয়ে আছে। বর্তমানে ইহা একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয় যে, মুসলিম যুবকেরা পশ্চিমা দেশগুলি থেকে সিরিয়া এবং ইরাকের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাচ্ছে, সেখানে তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এও সম্ভব যে, তারা তাদের দেশে ফিরে এসে আক্রমণ সংগঠিত করছে এবং সারা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। সুতরাং স্পষ্টতই এটি এখন আর কেবলমাত্র স্থানীয় সমস্যা বা মুসলিমদের সমস্যা নয় বরং এটা একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং এই চরমপন্থীদলগুলির সমূলে উৎপাটন করার জন্য বিশ্বব্যাপী এক সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতে এই যুদ্ধ শেষ হতে 30 থেকে 100 বছর সময় লাগবে। ব্যক্তিগতভাবে, আমি বিশ্বাস করি, এমন চরমপন্থী জঙ্গিগোষ্ঠীগুলিকে আরও অল্প সময়ের মধ্যেই রোধ করা সম্ভব, যদি এদের নির্মূল করতে সর্বসম্মতিক্রমে বদ্ধপরিকর হওয়া সম্ভব হয়।

এই যুদ্ধ শেষ হতে কয়েক যুগ কেটে যাবে এই অজুহাতে আমরা নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারি না। বরং সারা বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত এই চরমপন্থার বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে আমাদের প্রত্যেকের সামিল হওয়া উচিত। শুধুমাত্র ইসলাম এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে আমরা নিজেদের

এই দায়-দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে পারি না।

অতএব সকল শান্তিকামী মানুষের উচিৎ তাদের সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা এবং অবশ্যই সকল রাজনীতিবিদ ও প্রভাবশালী ব্যক্তির উচিৎ এদিকে দিকপাত করা এবং তাদের নিজস্ব প্রভাবাধীন গন্ডির মধ্যে, প্রকৃত ন্যায়-বিচার স্থাপনের লক্ষ্যে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করা এবং বিশ্বশান্তিকে সম্পূর্ণ বিনাশ হবার হাত থেকে রক্ষা করা। যদি আমরা এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে চাই, তবে সমাজের প্রতিটি স্তরে সত্যিকারের ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে হবে এবং যে সমস্ত দেশ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীন সমাধান করতে হবে যাতে নিরাশা দূরীভূত হয়।

কোনও দেশের সম্পদের প্রতি ঈর্ষান্বিত দৃষ্টির প্রয়োগ করা যাবে না এবং পারস্পরিক সাহায্যের উদ্দেশ্যে নীতি প্রনয়ণ করতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই বিশ্বকে অনুধাবন করতে হবে, সে তার সৃষ্টিকর্তাকে বিস্মৃত হয়েছে এবং তাদের সবাইকে তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করতেই হবে। একমাত্র এভাবেই সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এছাড়া আর কোনও পথ নেই।

পূর্বেও বহুবার আমি আরও একটি বিশ্ব যুদ্ধের ভয়াবহ ফলাফল সম্বন্ধে অবগত করেছি। ব্যক্তিগত উচ্চাশা এবং কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে তৈরি অন্যায় নীতির পরিনাম যে কেমন ধ্বংসাত্মক এবং ভয়াবহ হতে পারে তা হয়তবা এই পৃথিবী আরও একটা বিশ্ব-যুদ্ধের মর্মান্তিক পরিণতির আগে অনুভব করতে পারবে না। আমার আকাঙ্খা এবং প্রার্থনা পৃথিবী যেন ধ্বংস হবার পূর্বেই নিজের সম্বিৎ ফিরে পায়। আমি প্রার্থনা করি যেন বিশ্ববাসী তাদের স্রষ্টাকে চিনতে পারে এবং মান্য করতে পারে। এই প্রার্থনার সাথেই আমি বিদায় নিচ্ছি, আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।”

অনুবাদক : ডা: সুস্তলীন সাহাদাত ও আতাউল মোনেম আহমদ
বড়িশা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পশ্চিমবঙ্গ